ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ২য় পত্র: ফিকহুল মুআশারাহ ও মুসলিম পারিবারিক আইন

খ বিভাগ: কানুনুল উসরাতিল মুসলিমাহ (মুসলিম পারিবারিক আইন)

(রচনামূলক প্রশ্ন)

১. মুসলিম পারিবারিক আইনে বিবাহের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব আলোচনা কর। রেজিস্ট্রেশন না করার শাস্তি কী? (ناقش تعريف الزواج وأهدافه وأهمية تسجيله في قانون الأسرة المسلمة - وما هي عقوبة عدم التسجيل؟)

২. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ (Maintenance) সম্পর্কে বাংলাদেশী আইনের বিধান কী? আদালত কখন দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের আদেশ দেন? (ما هو حكم نفقة الزوجة في القانون البنغلاديشي؟ ومتى تأمر المحكمة بإعادة الحقوق الزوجية؟)

৩. মহর (Dower)-এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ (তাৎক্ষণিক ও বিলম্বিত) আলোচনা কর। বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর মহরের বিধান কী? (ناقش تعريف المهر وأنواعه (المعجل والمؤجل) - وما هو حكم المهر بعد الطلاق أو وفاة الزوج؟)

৪. মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী তালাক প্রদানের প্রক্রিয়া ও শর্তাবলি সবিস্তারে আলোচনা কর। এ প্রক্রিয়ায় সালিশি পরিষদের ভূমিকা কী? (ناقش بالتفصيل إجراءات الطلاق وشروطه بموجب قانون الأسرة المسلمة - وما هو دور مجلس التحكيم في هذه العملية؟)

৫. সন্তানের বংশ পরিচয় (Paternity) ও যেনার (Illegitimacy) বৈধতা ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশী আইনে মুসলিম ফিকহের মূলনীতিগুলো কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে? (كيف تم تطبيق مبادئ الفقه الإسلامي في القانون البنغلاديشي بخصوص نسب الأطفال وشرعية الزنى والاعتراف به؟)

৬. মুসলিম পারিবারিক আইনে সম্পত্তির অভিভাবকত্ব (Guardianship of Property) সংক্রান্ত বিধানাবলি কী কী? একজন অভিভাবকের অধিকার

ও কর্তব্য আলোচনা কর। (ما هي الأحكام المتعلقة بالولاية على الأموال (في قانون الأسرة المسلمة؟ وناقش حقوق الولي وواجباته

৭. আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ (Maintenance of Relatives) সম্পর্কে বাংলাদেশী আইনে কী বিধান রয়েছে? কোন ধরনের আত্মীয়দের জন্য ভরণ-পোষণ ওয়াজিব? (ما هو الحكم في القانون البنغلاديشي بخصوص نفقة الأقارب؟ وما هي أنواع الأقارب التي تجب عليهم النفقة؟)

৮. বিবাহের ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুমোদিত শর্তাবলি কী কী? ফাসিদ বা বাতিল শর্তের কারণে বিবাহের হুকুম কী হয়? ফিকহ ও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ কর। (ما هي الشروط المباحة شرعا في النكاح؟ وماذا يكون حكم النكاح بسبب الشروط الفاسدة أو الباطلة؟ حلل من منظور الفقه والقانون)

৯. ফিকহী দৃষ্টিতে 'তালাক' ও 'ফাসখ'-এর মধ্যকার পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। এগুলো আইনে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? (حلل الفروق بين "الطلاق" و "الفسخ" من الناحية الفقهية مع الأمثلة - وكيف انعكست هذه الفروق في القانون؟)

১০. মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। এটি মুসলিম পারিবারিক আইনে কী ধরনের সংস্কার এনেছে? (ناقش أهداف المرسوم العائلي الإسلامي لعام 1961 وميزاته - وما هي أنواع الإصلاحات التي أتى بها في قانون الأسرة المسلمة؟)

১১. দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার (Restitution of Conjugal Rights) বলতে কী বোঝায়? কোন পরিস্থিতিতে আদালত এ অধিকার পুনরুদ্ধারের আদেশ দেন- পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর আলোকে ব্যাখ্যা কর। (ما المقصود بـ "استرداد الحقوق الزوجية"؟ واشرح الظروف التي تأمر فيها المحكمة بإعادة هذا الحق في ضوء مرسوم محكمة الأسرة لعام 1985)

১২. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ ও ১৯৯৪ (সংশোধিত)-এর আওতায় বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। রেজিস্ট্রেশন না করার শাস্তি কী? (حلل عملية تسجيل الزواج

والطلاق بموجب قانون تسجيل الزواج والطلاق الإسلامي لعامي 1974 و 1994 (المعدل) وأهميته - وما هي عقوبة عدم التسجيل؟)
১৩. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ (Maintenance) সম্পর্কে মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর বিধানগুলো কী কী? স্ত্রী কখন ভরণ-পোষণের অধিকার হারায়? (ما هي أحكام مرسوم العائلة المسلمة لعام 1961 بخصوص نفقة الزوجة؟ ومتى تفقد الزوجة حقها في النفقة؟)
১৪. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ অনুযায়ী পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার ও কার্যপ্রণালী আলোচনা কর। এ আদালত কোন কোন বিষয়ে রায় দিতে পারে? (ناقش اختصاص محكمة الأسرة بموجب مرسوم محكمة الأسرة لعام 1985 وإجراءاتها - وما هي القضايا التي يمكن لهذه المحكمة أن تحكم فيها؟)
১৫. মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী তালাকের ক্ষেত্রে সালিশি পরিষদের (Arbitration Council) ভূমিকা কী? এটি কীভাবে বিচ্ছেদ কার্যকর করতে সাহায্য করে? (ما هو دور "مجلس التحكيم" في قضايا الطلاق بموجب مرسوم العائلة المسلمة؟ وكيف يساعد في تنفيذ الانفصال؟)

প্রশ্ন-১: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ঐতিহাসিক পটভূমি ও গুরুত্ব আলোচনা কর। এই অধ্যাদেশ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যগুলো কী ছিল?
(نَاقِشِ الْخَلْفِيَّةَ التَّارِيخِيَّةَ وَأَهَمِّيَّةَ قَانُونِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ لِعَامِ 1961م. وَمَا كَانَتِ الْأَهْدَافُ الرَّئِيسِيَّةُ لِسَنِّ هَذَا الْمَرْسُومِ؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ বাংলাদেশের পারিবারিক আইন ব্যবস্থার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী সংযোজন। ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা বিচার ব্যবস্থায় নারীদের অধিকার এবং এতিমদের উত্তরাধিকার নিয়ে যে জটিলতা ছিল, তা নিরসনের লক্ষ্যে এই আইনটি প্রণীত হয়। এটি মূলত প্রচলিত ইসলামি আইনের কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা সংস্কার আনার একটি প্রচেষ্টা, যা আজও বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতগুলোতে কার্যকর রয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি (আল-খলফিয়্যাতুত তারিখিয়্যাহ):

এই আইনটি হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। এর পেছনে দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও পর্যালোচনা ছিল।

১. নারী ও সমাজকর্মীদের দাবি: ১৯৪০ ও ৫০-এর দশকে অবিভক্ত পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নারীদের ওপর বহুবিবাহের নামে নির্যাতন এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীদের অসহায়ত্ব চরম আকার ধারণ করে। অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন (আপওয়া) সহ বিভিন্ন নারী সংগঠন পারিবারিক আইন সংস্কারের জোর দাবি জানায়।

২. রশিদ কমিশন গঠন (১৯৫৫): এই দাবির প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৫ সালের ৪ আগস্ট একটি ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করে, যার প্রধান ছিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আব্দুর রশিদ। এই কমিশনকে 'রশিদ কমিশন' বলা হয়।

৩. রিপোর্ট পেশ ও বিরোধ: কমিশন ১৯৫৬ সালে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। এতে বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ, তালাক রেজিস্ট্রেশন এবং এতিম নাতি-নাতনির উত্তরাধিকারের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু তৎকালীন আলেম সমাজ, বিশেষ করে মাওলানা ইহতেশামুল হক থানভী (রহ.) এই রিপোর্টের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং একে শরিয়ত বিরোধী বলে নোট অব ডিসেন্ট দেন।

৪. অধ্যাদেশ জারি (১৯৬১): দীর্ঘ বিতর্কের পর, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান সামরিক শাসনামলে ১৯৬১ সালের ১৫ জুলাই এই সুপারিশমালার ওপর ভিত্তি করে 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১' জারি করেন।

অধ্যাদেশ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যসমূহ:

এই আইনের প্রধান লক্ষ্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ: পুরুষদের যত্রতত্র একাধিক বিবাহ করার প্রবণতা রোধ করা এবং বহুবিবাহের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

২. তালাক প্রথা নিয়ন্ত্রণ: রাগের মাথায় তাৎক্ষণিক তালাক দিয়ে সংসার ভাঙার প্রবণতা কমানো এবং তালাক কার্যকর করার একটি আইনি কাঠামো তৈরি করা।

৩. এতিমদের অধিকার রক্ষা: মৃত ব্যক্তির এতিম নাতি-নাতনিরা যাতে দাদার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হয়, তার ব্যবস্থা করা।

৪. বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন: মৌখিক বিবাহ বা তালাকের আইনি জটিলতা এড়াতে রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা।

৫. নারীর ক্ষমতায়ন: মোহরানা ও ভরণপোষণের অধিকার আদায়ে আইনি সহায়তা সহজ করা।

আইনের গুরুত্ব:

এই অধ্যাদেশটি প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থায় বড় ধরণের পরিবর্তন নিয়ে আসে। এর ফলে নারীরা আইনি সুরক্ষা পায়। বিশেষ করে তালাক এবং বহুবিবাহের ক্ষেত্রে সালিসি পরিষদের (চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত) অনুমতি নেওয়ার বিধান সমাজিক অনাচার কমাতে সাহায্য করেছে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ নিয়ে আলেম সমাজের কিছু আপত্তি থাকলেও, রাষ্ট্রীয়ভাবে এটি পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির মূল দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এর মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা এবং দুর্বলদের অধিকার রক্ষার একটি আইনি ভিত্তি রচিত হয়েছে।

প্রশ্ন-২: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ৪ নং ধারা অনুযায়ী উত্তরাধিকারের বিধান কী? এই ধারাটি হানাফি ফিকহের সাথে কেন সাংঘর্ষিক মনে করা হয়? বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর।
(مَا هُوَ حُكْمُ الْمِيرَاثِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 4 مِنْ قَانُونِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ لِعَامِ 1961م؟ وَلِمَاذَا يُعْتَبَرُ هَذَا الْبَنْدُ مُتَعَارِضًا مَعَ الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ؟ حَلِّلْ بِالتَّفْصِيلِ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের সবচেয়ে আলোচিত এবং বিতর্কিত ধারাটি হলো ৪ নং ধারা। এই ধারায় মৃত ব্যক্তির আগে মারা যাওয়া সন্তানের সন্তানদের (এতিম নাতি-নাতনি) উত্তরাধিকার স্বত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চিরাচরিত ইসলামি ফিকহের বন্টন নীতির সাথে এই ধারার বিধানের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

৪ নং ধারার বিধান (হুকুমুল মাদ্দাহ ৪):

১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে:

"উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের সময় যদি দেখা যায় যে, মৃত ব্যক্তির (প্রোপোজিশাস) কোনো ছেলে বা মেয়ে তার জীবদ্দশায় মারা গেছে, তবে ওই মৃত ছেলে বা মেয়ের সন্তানরা (নাতি-নাতনিরা) ঠিক ততটুকু অংশ পাবে, যতটুকু অংশ তাদের বাবা বা মা বেঁচে থাকলে পেতেন।"

একে আইনের পরিভাষায় **'প্রতিনিধিত্বের নীতি'** (Doctrine of Representation) বলা হয়। অর্থাৎ, মৃত বাবার স্থলাভিষিক্ত হয়ে সন্তানরা দাদার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। চাচারা বেঁচে থাকলেও এতিম ভাতিজারা বঞ্চিত হবে না।

হানাফি ফিকহের সাথে সংঘর্ষ ও পার্থক্য:

এই ধারাটি হানাফি ফিকহ তথা মূল ইসলামি ফারায়েজের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণগুলো নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. আল-হাজব বা বঞ্চিত হওয়ার নীতি:

- **হানাফি ফিকহ:** শরিয়তের বন্টন নীতি হলো— "নকটবর্তী ওয়ারিশের উপস্থিতিতে দূরবর্তী ওয়ারিশ বঞ্চিত হয়।" (আল-আকরাব ফাল-আকরাব)। অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির নিজের ছেলে (চাচা) বেঁচে থাকলে, মৃত ছেলের সন্তান (নাতি) মিরাস পায় না। কারণ ছেলের সম্পর্ক নাতির চেয়ে ঘনিষ্ঠ।

- **১৯৬১ সালের আইন:** এই আইনে নিকটবর্তী ওয়ারিশ (চাচা) থাকা সত্ত্বেও দূরবর্তী ওয়ারিশকে (নাতিকে) অংশ দেওয়া হয়েছে, যা ফিকহী মূলনীতির পরিপন্থী।

২. **অংশের পরিমাণ:**

- **হানাফি ফিকহ:** শরিয়তে এতিম নাতিদের জন্য দাদাকে 'ওসিয়ত' (সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সরাসরি ওয়ারিশ করা হয়নি।

- **১৯৬১ সালের আইন:** এই আইনে নাতি-নাতনিকে সরাসরি ওয়ারিশ বানানো হয়েছে এবং তাদের বাবার পূর্ণ অংশ দেওয়া হয়েছে, যা অনেক সময় অন্য ওয়ারিশদের হকের ওপর প্রভাব ফেলে।

৩. নারী-পুরুষের অনুপাত:

অনেক সময় এই আইনের প্রয়োগে দেখা যায় যে, নাতনি (মৃত ছেলের মেয়ে) ফুফুর (মৃতের নিজের মেয়ে) চেয়ে বেশি সম্পত্তি পেয়ে যাচ্ছে, যা ইসলামি বন্টন নীতির ভারসাম্য নষ্ট করে।

আইনটির পক্ষে যুক্তি:

আইন প্রণেতাদের যুক্তি ছিল, সমাজিক বাস্তবতায় দাদারা অনেক সময় এতিম নাতিদের জন্য ওসিয়ত করেন না এবং চাচারাও ভাতিজাদের হক দেন না। ফলে এতিম শিশুরা রাস্তায় বসে যায়। এই 'মানবিক' দিক বিবেচনা করেই রাষ্ট্র ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে এই আইন করেছে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

৪ নং ধারাটি এতিম শিশুদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা। যদিও এটি ক্লাসিক্যাল ফিকহের সাথে মেলে না, কিন্তু বাংলাদেশের

আদালতে বর্তমানে এই আইন অনুযায়ীই এতিম নাতি-নাতনিদের সম্পত্তি বন্টন করা হয়। আলেমগণ একে 'ওসিয়তে ওয়াজিবাহ'র (বাধ্যতামূলক ওসিয়ত) একটি আইনি রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন-৩: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ৬ নং ধারা মোতাবেক বহুবিবাহের বিধি-নিষেধগুলো আলোচনা কর। সালিসি পরিষদের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে কী শাস্তি হতে পারে?

نَاقِشْ قُيُودَ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 6 مِنْ قَانُونِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ لِعَامِ 1961م. وَمَا هِيَ عُقُوبَةُ الزَّوَاجِ بِدُونِ إِذْنِ لَجْنَةِ التَّحْكِيمِ؟

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলাম শর্তসাপেক্ষে বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু এই অনুমতির অপব্যবহার রোধে এবং স্ত্রীদের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৬ নং ধারায় বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, তবে এটিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা সংকুচিত (Restricted) করা হয়েছে।

৬ নং ধারা অনুযায়ী বহুবিবাহের বিধি-নিষেধ:

এই আইন অনুযায়ী, কোনো বিবাহিত পুরুষ যদি স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় আরেকটি বিবাহ করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে:

১. সালিসি পরিষদের অনুমতি (ইজনুল মাজলিস):

দ্বিতীয় বিবাহের আগে স্বামীকে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা পৌর মেয়রের কাছে লিখিত আবেদন করতে হবে। চেয়ারম্যান এবং বর্তমান স্ত্রীর মনোনীত প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি 'সালিসি পরিষদ' গঠিত হবে। এই পরিষদের লিখিত অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে না।

২. আবেদনের কারণ ও ফি:

আবেদনে উল্লেখ করতে হবে যে, কেন তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চান এবং এতে বর্তমান স্ত্রীর সম্মতি আছে কি না। এর সাথে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে।

৩. অনুমতির শর্তাবলি:

সালিসি পরিষদ কেবল তখনই অনুমতি দেবে যদি তারা মনে করে যে বিবাহটি 'প্রয়োজনীয় এবং ন্যায়ানুগ'। যেমন:

- বর্তমান স্ত্রী বন্ধ্যা বা শারীরিকভাবে অক্ষম হলে।
- বর্তমান স্ত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ হলে।
- অথবা অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত শরয়ী কারণ থাকলে।

অনুমতি ছাড়া বহুবিবাহের শাস্তি (আল-উকুবাহ):

যদি কোনো ব্যক্তি সালিসি পরিষদের অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করে, তবে ৬ নং ধারার ৫ উপ-ধারা অনুযায়ী তাকে তিনটি শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে:

১. তাৎক্ষণিক মোহরানা পরিশোধ:

বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীদের সম্পূর্ণ মোহরানা (নগদ ও বাকি) তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধ না করলে তা 'বকেয়া ভূমি রাজস্ব' হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

২. কারাদণ্ড:

অনুমতিবিহীন বহুবিবাহ একটি ফৌজদারি অপরাধ। এর জন্য তাকে ১ বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হতে পারে।

৩. জরিমানা:

অথবা তাকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। অথবা জেল ও জরিমানা উভয় দণ্ড দেওয়া হতে পারে।

বিবাহের বৈধতা:

লক্ষণীয় বিষয় হলো, অনুমতি না নিয়ে বিবাহ করলে স্বামী শাস্তি পাবে ঠিকই, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহটি বাতিল হবে না। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় স্ত্রীও তার অধিকার পাবে, তবে স্বামী রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গের দায়ে দণ্ডিত হবে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

৬ নং ধারার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে বহুবিবাহের নামে নারীদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করা। কুরআনে বর্ণিত 'আদল' বা ন্যায়বিচারের শর্তটি যাতে পালিত হয়, রাষ্ট্র এই আইনের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে। এর ফলে সমাজে একতরফা ও খামখেয়ালি বহুবিবাহের প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

প্রশ্ন-৪: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ৭ নং ধারা অনুযায়ী তালাক প্রদানের পদ্ধতি ও কার্যকারিতা বিস্তারিত আলোচনা কর। ৯০ দিনের নোটিশ পিরিয়ড লঙ্ঘনের ফলাফল কী?
(نَاقِشْ إِجْرَاءَاتِ وَفَعَالِيَّةَ الطَّلَاقِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 7 مِنْ قَانُونِ الْأُحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ لِعَامِ 1961م. وَمَا نَتِيجَةُ مُخَالَفَةِ فَتْرَةِ الْإِشْعَارِ لِمُدَّةِ 90 يَوْمًا؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

তালাক প্রদান স্বামীর শরয়ী অধিকার হলেও রাগের মাথায় হুটহাট তালাক দিয়ে সংসার ভাঙার ঘটনা সমাজে অহরহ ঘটে। এই বিশৃঙ্খলা রোধে এবং তালাকের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের ৭ নং ধারায় তালাক কার্যকরের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আইনি পদ্ধতি বেধে দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিটি মূলত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'মীমাংসা' বা 'হাকাম' (Arbitration) ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

৭ নং ধারা অনুযায়ী তালাক প্রদানের পদ্ধতি:

আইন অনুযায়ী তালাক কার্যকর হতে হলে নিম্নোক্ত তিনটি ধাপ অতিক্রম করা অপরিহার্য:

১. লিখিত নোটিশ প্রদান (আল-ইশ'আর):

স্বামী যেকোনো পদ্ধতিতে (মৌখিক বা লিখিত) তালাক উচ্চারণ করার পর, তাকে অবিলম্বে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌর মেয়রের কাছে তালাকের সংবাদটি লিখিতভাবে নোটিশ আকারে জানাতে হবে।

- একই সাথে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ওই নোটিশের একটি কপি পাঠাতে হবে।

- নোটিশ না দিলে তালাক কার্যকর হবে না এবং স্বামী শাস্তিযোগ্য অপরাধী হবে।

২. সালিসি পরিষদ গঠন (তাশ কিলু লাজনাতিত তাহকিম):

নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান উভয় পক্ষকে (স্বামী ও স্ত্রী) আপস-মীমাংসার জন্য প্রতিনিধি পাঠাতে বলবেন এবং একটি 'সালিসি পরিষদ' গঠন করবেন। এই পরিষদের কাজ হলো উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সংসারটি টিকিয়ে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

৩. ৯০ দিনের ইদ্দতকাল বা সময়সীমা:

নোটিশ চেয়ারম্যানের দপ্তরে পৌঁছানোর তারিখ থেকে ৯০ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাকটি কার্যকর হবে না। এই সময়কে 'কুলিং পিরিয়ড' বা ইদ্দতকাল ধরা হয়।

৯০ দিনের নোটিশ পিরিয়ডের গুরুত্ব ও কার্যক্রম:

এই ৯০ দিন সময়ের মধ্যে সালিসি পরিষদ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর করার চেষ্টা করবে।

- **মীমাংসা হলে:** যদি ৯০ দিনের মধ্যে স্বামী তালাক প্রত্যাহার করে (রুজু করে) অথবা তাদের মধ্যে মিল হয়ে যায়, তবে তালাক বাতিল হয়ে যাবে এবং চেয়ারম্যান তালাকটি নথিভুক্ত করবেন না।
- **মীমাংসা না হলে:** যদি ৯০ দিন পার হয়ে যায় এবং কোনো সমাধান না আসে, তবে ৯১তম দিনে তালাকটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে **কার্যকর (Effective)** হয়ে যাবে। তখন চেয়ারম্যান তালাক কার্যকরের সনদ দেবেন।

বিশেষ বিধান (গর্ভবতী নারী):

তালাকের সময় স্ত্রী যদি গর্ভবতী থাকে, তবে ৯০ দিন পার হলেই তালাক কার্যকর হবে না। বরং ৯০ দিন অথবা সন্তান প্রসব— এই দুটির মধ্যে যেটি পরে হবে, ততদিন পর্যন্ত তালাক স্থগিত থাকবে। সন্তান প্রসবের পর তালাক কার্যকর হবে।

আইন লঙ্ঘনের শাস্তি:

যদি কোনো ব্যক্তি তালাক দেওয়ার পর চেয়ারম্যান ও স্ত্রীকে নোটিশ না দেয়, তবে ৭ নং ধারার ২ উপ-ধারা অনুযায়ী তার শাস্তি হবে:

- **১ বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড।**
- অথবা **১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা।**
- অথবা উভয় দণ্ড।

নোটিশ না দেওয়ার কারণে তালাক কার্যকর হবে না এবং স্ত্রী তার আইনগত স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হবে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

৭ নং ধারার মূল উদ্দেশ্য তালাক দেওয়া নয়, বরং তালাক ঠেকানো। রাগের মাথায় দেওয়া তালাক যাতে সাথে সাথে কার্যকর হয়ে সংসার ধ্বংস না করে, সে জন্য রাষ্ট্র এই ৯০ দিনের সময়সীমা বেধে দিয়েছে। এটি ইসলামি শরিয়তের 'সুলহ' বা সন্ধির মেজাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এই ধারার অধীনে কার্যকর হওয়া তালাকটি 'তালাকে রাজয়ী' হিসেবে গণ্য হয়, অর্থাৎ ৯০ দিনের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে।

প্রশ্ন-৫: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ৯ নং ধারা অনুযায়ী ভরণপোষণ (নাফাকাহ) আদায়ের পদ্ধতি কী? স্বামী ভরণপোষণ না দিলে স্ত্রীর আইনি প্রতিকার আলোচনা কর।
(مَا هِيَ إِجْرَاءَاتُ تَحْصِيلِ النَّفَقَةِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 9 مِنْ قَانُونِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ لِعَامِ 1961م؟ وَمَا هُوَ الْعِلَاجُ الْقَانُونِيُّ لِلزَّوْجَةِ إِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ عَنِ الْإِنْفَاقِ؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

স্ত্রীর ভরণপোষণ বা 'নাফাকাহ' স্বামীর ওপর ফরজ। কিন্তু অনেক স্বামী অবহেলাবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেয় না। আগে এর জন্য দীর্ঘ দেওয়ানি মামলার প্রয়োজন হতো। এই ভোগান্তি কমাতে ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের ৯ নং ধারায় ভরণপোষণ আদায়ের একটি দ্রুত ও সহজ প্রশাসনিক পদ্ধতি রাখা হয়েছে।

৯ নং ধারার বিধান ও পদ্ধতি:

যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে পর্যাপ্ত ভরণপোষণ না দেয়, অথবা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমানভাবে ভরণপোষণ বন্টন না করে, তবে স্ত্রী নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন:

১. চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন:

স্ত্রী স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌর মেয়রের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ বা আবেদন করতে পারেন। এখানে আদালতের মতো জটিল প্রক্রিয়া নেই।

২. সালিসি পরিষদ গঠন:

আবেদন পাওয়ার পর চেয়ারম্যান একটি 'সালিসি পরিষদ' গঠন করবেন। এই পরিষদে চেয়ারম্যান ছাড়াও স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন।

৩. পরিমাণ নির্ধারণ:

সালিসি পরিষদ স্বামীর আয় এবং স্ত্রীর প্রয়োজন বিবেচনা করে ভরণপোষণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (টাকা) নির্ধারণ করে দেবে। একই সাথে বকেয়া ভরণপোষণও নির্ধারণ করতে পারে।

৪. রায় বা সিদ্ধান্ত:

পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে, যদি তা সর্বসম্মত হয়। স্বামী সেই নির্ধারিত টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন।

আদায়ের পদ্ধতি (Recovery):

স্বামী যদি সালিসি পরিষদের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ না করে, তবে তা আদায়ের কঠোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ৯ নং ধারার ৩ উপ-ধারা অনুযায়ী, বকেয়া ভরণপোষণ 'বকেয়া ভূমি রাজস্ব' (Arrears of Land Revenue) হিসেবে আদায় করা হবে। অর্থাৎ, সরকার যেভাবে জমির খাজনা অনাদায়ে কঠোর ব্যবস্থা নেয় (ক্রোক বা নিলাম), ঠিক সেভাবেই স্বামীর কাছ থেকে টাকা আদায় করে স্ত্রীকে দেওয়া হবে।

পুনর্বিবেচনা বা রিভিশন:

যদি সালিসি পরিষদের রায়ে কোনো পক্ষ অসন্তুষ্ট হয়, তবে তারা ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সহকারী জজ আদালতে (পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ অনুযায়ী) রিভিশন বা আপিল করতে পারবে। আদালতের রায়ই চূড়ান্ত হবে।

বিশ্লেষণ:

যদিও বর্তমানে ১৯৮৫ সালের 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ' অনুযায়ী সরাসরি আদালতে মামলা করার সুযোগ বেশি জনপ্রিয়, তবুও ১৯৬১ সালের ৯ নং ধারার প্রশাসনিক ক্ষমতা এখনো বলবৎ আছে। এটি গ্রামীণ নারীদের জন্য আদালত পর্যন্ত না গিয়ে স্থানীয়ভাবে সমাধান পাওয়ার একটি উত্তম মাধ্যম।

উপসংহার (আল-খাতিমা):
৯ নং ধারাটি নারীদের অর্থনৈতিক সুরক্ষার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। স্বামী যাতে ভরণপোষণ দিতে গড়িমসি করতে না পারে, সে জন্য রাষ্ট্র এই ধারা অনুযায়ী সালিসি পরিষদকে বিচারিক ক্ষমতা দিয়েছে।

প্রশ্ন-৬: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ১০ নং ধারা অনুযায়ী 'মহরানা' পরিশোধের পদ্ধতি কী? পরিশোধের সময় উল্লেখ না থাকলে আইনের বিধান কী হবে?
(مَا هِيَ طَرِيقَةُ دَفْعِ الْمَهْرِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 10 مِنْ قَانُونِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ لِعَامِ 1961م؟ وَمَا حُكْمُ الْقَانُونِ إِذَا لَمْ يُحَدَّدْ وَقْتُ الدَّفْعِ؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

মহরানা নারীর একচ্ছত্র অধিকার। ইসলামি শরিয়তে মহরানা দুই প্রকার হতে পারে: 'মুয়াজ্জাল' (আশু বা নগদ) এবং 'মুওয়াজ্জাল' (বিলম্বিত)। কিন্তু কাবিননামায় অনেক সময় স্পষ্টভাবে লেখা থাকে না যে কতটুকু নগদ আর কতটুকু বাকি। এই অস্পষ্টতা দূর করার জন্য ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের ১০ নং ধারায় একটি স্পষ্ট বিধান রাখা হয়েছে।

১০ নং ধারার বিধান:
এই ধারায় বলা হয়েছে, যদি বিবাহের কাবিননামায় বা চুক্তিতে মহরানা পরিশোধের পদ্ধতি (Mode of Payment) সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত উল্লেখ না থাকে, তবে আইনের দৃষ্টিতে ধরে নেওয়া হবে যে:

"সম্পূর্ণ মহরানা 'মুয়াজ্জাল' বা আশু (Prompt) হিসেবে গণ্য হবে।"

বিশ্লেষণ ও ফলাফল:

এই বিধানটির ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং নারীদের জন্য সুবিধাজনক।

১. তাৎক্ষণিক দাবি: যেহেতু আইন অনুযায়ী পুরো টাকাই 'নগদ' হিসেবে গণ্য হচ্ছে, তাই স্ত্রী বিবাহের পর যেকোনো সময় স্বামীর কাছে পুরো মহরানা দাবি করতে পারেন।

২. স্বামীর বাধ্যবাধকতা: স্ত্রী দাবি করা মাত্রই স্বামীকে তা পরিশোধ করতে হবে। স্বামী বলতে পারবে না যে, "বাকিটা পরে দেব" বা "তালাক বা মৃত্যুর সময় দেব"। কারণ আইনে অস্পষ্টতার সুযোগে পুরোটাকেই নগদ ধরা হয়েছে।

৩. আদালতের ক্ষমতা: যদি স্বামী দিতে অস্বীকার করে, তবে স্ত্রী আদালতের মাধ্যমে তা আদায় করতে পারেন। এই ধারাটি মূলত স্বামীদের বাধ্য করে যাতে তারা বিবাহের সময় মহরের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন।

শরিয়তের সাথে তুলনা:

হানাফি ফিকহে সাধারণত বলা হয়, যদি উল্লেখ না থাকে তবে প্রথা বা 'উরফ' অনুযায়ী কিছু অংশ নগদ ও কিছু অংশ বাকি ধরা হবে। কিন্তু ১৯৬১ সালের আইন ফিকহী মতভেদ নিরসন করে নারীদের সুবিধার্থে পুরোটাকেই 'চাহিবা মাত্র দেওয়যোগ্য' বলে রায় দিয়েছে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

১০ নং ধারাটি মহরানা নিয়ে তালবাহানা বন্ধ করার একটি আইনি রক্ষাকবচ। এটি স্বামীদের সতর্ক করে দেয় যে, মহরানা কোনো কাগুজে প্রতিশ্রুতি নয়, বরং এটি একটি নগদ ঋণ। তাই কাবিননামায় স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে স্বামীকে যেকোনো মুহূর্তে পুরো টাকা পরিশোধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

আপনার সরবরাহকৃত **'খ বিভাগ : মুসলিম পারিবারিক আইন'**-এর প্রশ্নতালিকা অনুযায়ী **৭, ৮ এবং ৯ নম্বর** রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর নিচে উপস্থাপন করা হলো।

প্রজেক্টের নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজি শব্দ বর্জন করা হয়েছে এবং লেকচার গাইডের আদলে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৭: আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ (নাফাকাতুল আকারিব) সম্পর্কে বাংলাদেশী আইনে কী বিধান রয়েছে? কোন ধরনের আত্মীয়দের জন্য ভরণ-পোষণ ওয়াজিব? (مَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْقَانُونِ الْبَنْغَلَادِيشِيِّ بِخُصُوصِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ؟ وَمَا هِيَ أَنْوَاعُ الْأَقَارِبِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তি হলো পারিবারিক বন্ধন। রাষ্ট্র বা সরকার সাহায্য করার আগে সচ্ছল আত্মীয়দের ওপর গরিব আত্মীয়দের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী ও সন্তানের বাইরে পিতা-মাতা এবং অন্য রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের ভরণপোষণকে 'নাফাকাতুল আকারিব' বলা হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম আইনে আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ একটি আইনগত অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলাদেশী আইনে আত্মীয়দের ভরণ-পোষণের বিধান:

বাংলাদেশে আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ আদায়ের জন্য প্রধানত 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫' অনুসরণ করা হয়। যদিও এই অধ্যাদেশে ভরণ-পোষণের নতুন কোনো সংজ্ঞা তৈরি করা হয়নি, তবে এটি ইসলামি ব্যক্তিগত আইন (হানাফি ফিকহ) প্রয়োগের পথ সুগম করেছে।

১. পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার:

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫-এর ৫ নং ধারা অনুযায়ী, পারিবারিক আদালত ৫টি বিষয়ে বিচার করার ক্ষমতা রাখে, যার মধ্যে অন্যতম হলো 'ভরণ-পোষণ'। এই ধারায় কেবল স্ত্রী বা সন্তানের কথা বলা হয়নি, বরং ব্যাপক অর্থে 'ভরণ-পোষণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে বৃদ্ধ পিতা-মাতা বা অভাবী আত্মীয়রা এই আইনের অধীনে সচ্ছল আত্মীয়ের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন।

২. পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩:

যদিও এটি পারিবারিক আইনের সরাসরি অংশ নয়, তবুও ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করার জন্য একটি স্বতন্ত্র আইন পাস করেছে। এই আইন অনুযায়ী, কোনো সন্তান যদি তার পিতা-মাতাকে ভরণ-পোষণ না দেয়, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর মাধ্যমে পিতা-মাতার অধিকারকে আরও শক্তিশালী আইনি ভিত্তি দেওয়া হয়েছে।

যাদের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব (প্রকারভেদ):

হানাফি ফিকহ এবং বাংলাদেশী আদালতে প্রয়োগকৃত আইন অনুযায়ী, তিন শ্রেণীর আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব:

১. পিতা-মাতা ও উর্ধ্বতন আত্মীয় (উসুল):

সন্তানের ওপর পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ 'ফরজ'। এটি কেবল দয়া নয়, আইনি বাধ্যবাধকতা।

- **শর্ত:** পিতা-মাতা গরিব হতে হবে (তাদের নিজস্ব সম্পদ থাকলে সন্তান দেবে না) এবং সন্তান উপার্জনে সক্ষম হতে হবে।
- **বিধান:** যদি বাবা-মা কাজ করতে সক্ষমও হন, তবুও তাদের কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না। সন্তানকেই আয় করে খাওয়াতে হবে। বিশেষ করে মায়ের খরচ সম্পূর্ণ সন্তানের ওপর। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ওপর সমানভাবে (বা সামর্থ্য অনুযায়ী) এই দায়িত্ব বর্তায়।

২. সন্তান ও অধস্তন আত্মীয় (ফুরু):

পিতার ওপর নাবালক সন্তানের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব।

- **সাবালক সন্তান:** সাধারণ অবস্থায় সাবালক ছেলের ভরণ-পোষণ বাবার ওপর ওয়াজিব নয়। তবে যদি ছেলে প্রতিবন্ধী, পাগল বা উপার্জনে অক্ষম হয়, তবে বাবার ওপর দায়িত্ব বহাল থাকবে।
- **কন্যা সন্তান:** অবিবাহিত মেয়েদের (বয়স যা-ই হোক) ভরণ-পোষণ বাবার ওপর ওয়াজিব। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মেয়ে যদি অভাবী হয়, তবে বাবার ওপর দায়িত্ব ফিরে আসে।

৩. অন্যান্য আত্মীয় (জু-রাহামে মাহরাম):

বাবা-মা ও সন্তান ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়দের (যাদের সাথে বিবাহ হারাম— যেমন ভাই-বোন, চাচা-ফুফু) ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার জন্য তিনটি কঠিন শর্ত রয়েছে:

- **অভাব ও অক্ষমতা:** আত্মীয়টি গরিব এবং উপার্জনে অক্ষম হতে হবে (শিশু, পাগল, অন্ধ বা প্রতিবন্ধী)। সুস্থ ও কর্মক্ষম ভাই-বোনের খরচ দেওয়া ওয়াজিব নয়।
- **দাতার সচ্ছলতা:** দাতার নিজের পরিবারের খরচ বাদে অতিরিক্ত সম্পদ থাকতে হবে।
- **উত্তরাধিকার সম্পর্ক:** দাতা ওই আত্মীয়ের ওয়ারিশ হওয়ার যোগ্য হতে হবে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

বাংলাদেশে পারিবারিক আদালতগুলো এখন আত্মীয়দের, বিশেষ করে বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আদায়ে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এটি ইসলামি অর্থনীতির এক অনন্য সৌন্দর্য, যা সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করে এবং পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করে।

প্রশ্ন-৮: বিবাহের ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুমোদিত শর্তাবলি কী কী? ফাসিদ বা বাতিল শর্তের কারণে বিবাহের হুকুম কী হয়? ফিকহ ও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ কর।
(مَا هِيَ الشُّرُوطُ الْمُبَاحَةُ شَرْعًا فِي النِّكَاحِ؟ وَمَاذَا يَكُونُ حُكْمُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ أَوِ الْبَاطِلَةِ؟ حَلِّلْ مِنْ مَنْظُورِ الْفِقْهِ وَالْقَانُونِ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

বিবাহ একটি দেওয়ানি চুক্তি (Civil Contract)। যেকোনো চুক্তির সময় পক্ষগণ কিছু শর্ত আরোপ করতে পারে। ইসলামি শরিয়তে বিবাহের সময় শর্ত আরোপ করার সুযোগ রয়েছে, তবে সব ধরনের শর্ত গ্রহণযোগ্য নয়। শর্তের বৈধতা ও অবৈধতার ওপর ভিত্তি করে বিবাহের হুকুম পরিবর্তিত হয়।

শরীয়ত অনুমোদিত বা সহীহ শর্তাবলি (আশ-শুরুত আস-সহীহাহ):

যেসব শর্ত বিবাহের মূল উদ্দেশ্যের (মুকতাজায়ে আকদ) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা শরিয়ত ও প্রথা দ্বারা সমর্থিত, সেগুলোকে সহীহ শর্ত বলা হয়। এগুলো পালন করা ওয়াজিব।

উদাহরণ:

১. মহর ও ভরণ-পোষণ: মহরের পরিমাণ বাড়ানো বা ভরণ-পোষণের মান নিশ্চিত করার শর্ত।

২. বাসস্থান: স্ত্রীকে উপযুক্ত ও নিরাপদ বাসস্থান দেওয়ার শর্ত।

৩. তাফভিজে তালাক: স্ত্রী যদি শর্ত দেয় যে, "স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা আমার হাতে থাকবে" এবং স্বামী তা মেনে নেয়, তবে এটি একটি বৈধ শর্ত। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এবং কাবিননামার ১৮ নং কলামে এটি স্বীকৃত।

ফাসিদ বা বাতিল শর্ত (আশ-শুরুত আল-ফাসিদাহ):

যেসব শর্ত বিবাহের মূল উদ্দেশ্যের বিরোধী অথবা যাতে কারো কোনো লাভ নেই, অথবা যা শরিয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোকে ফাসিদ বা বাতিল শর্ত বলা হয়।

উদাহরণ:

১. "আমি তোমাকে বিয়ে করব, কিন্তু মহর দেব না।"

২. "আমি তোমাকে বিয়ে করব, কিন্তু ভরণ-পোষণ দেব না।"

৩. "বিয়ে করব, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর তালাক দিয়ে দেব (মুতআ)।"

৪. "তোমার সতীনকে তালাক দিতে হবে।"

ফাসিদ শর্তের কারণে বিবাহের হুকুম:

এখানে হানাফি ফিকহ এবং অন্যান্য মাযহাবের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

১. হানাফি ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গি:

হানাফি মাযহাবের একটি বিখ্যাত মূলনীতি হলো—

"বিবাহের শর্তগুলো বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু বিবাহ সহীহ থাকে।"

(النِّكَاحُ لَا يَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ)

অর্থাৎ, বিবাহের আকদের সময় যদি কোনো অবৈধ শর্ত যুক্ত করা হয়, তবে শর্তটি বাতিল (Void) বলে গণ্য হবে, কিন্তু বিবাহ চুক্তিটি 'সহীহ' বা শুদ্ধ হবে।

- **উদাহরণ:** স্বামী বলল, "মহর দেব না" শর্তে বিয়ে করলাম। হানাফি মতে, বিবাহ হয়ে যাবে, কিন্তু 'মহর দেব না' শর্তটি বাতিল হবে এবং স্বামীকে 'মহরে মিসল' (প্রথাগত মহর) দিতে বাধ্য করা হবে।
- **ব্যতিক্রম:** যদি শর্তটি এমন হয় যা বিবাহের মূল কাঠামোকেই নষ্ট করে দেয় (যেমন— নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে বা মুতআ), তবে বিবাহ বাতিল হবে।

২. আইনের দৃষ্টিভঙ্গি (বাংলাদেশী আইন):

বাংলাদেশের পারিবারিক আইনে হানাফি ফিকহের এই নীতিটিই অনুসরণ করা হয়। তবে 'তাফভিজে তালাক' বা তালাকের ক্ষমতা অর্পণের শর্তটি আইনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **বসবাসের শর্ত:** যদি স্ত্রী শর্ত দেয় যে, "স্বামী আমাকে নিয়ে আমার বাবার বাড়িতে থাকবে" বা "শহরের বাইরে নেবে না"— হানাফি ফিকহ মতে এই শর্তটি ফাসিদ এবং স্বামী মানতে বাধ্য নয়। কিন্তু আধুনিক আদালতে অনেক সময় স্ত্রীর সুবিধার কথা চিন্তা করে এই শর্ত ভঙ্গের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের (তালাক) আবেদন গ্রহণ করা হয়, যদি তা কাবিননামায় উল্লেখ থাকে।
- **দ্বিতীয় বিবাহের শর্ত:** কাবিননামায় যদি শর্ত থাকে যে, "আমার অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে না", তবে এটি একটি বৈধ শর্ত এবং এটি লঙ্ঘন করলে স্ত্রী তালাক নিতে পারে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

বিবাহের শর্তারোপের ক্ষেত্রে হানাফি ফিকহ অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়। এটি অবৈধ শর্তের কারণে বিবাহ ভেঙে দিয়ে সংসার নষ্ট করে না, বরং অবৈধ শর্তটি বাতিল করে

শরিয়তের বিধান (যেমন মহর ও খোরপোষ) বলবৎ করে। এতে নারীর অধিকার সুরক্ষিত হয়।

প্রশ্ন-৯: ফিকহী দৃষ্টিতে 'তালাক' ও 'ফাসখ'-এর মধ্যকার পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। এগুলো আইনে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? (حَلِّلِ الْفُرُوقَ بَيْنَ "الطَّلَاقِ" وَ "الْفَسْخِ" مِنَ النَّاحِيَةِ الْفِقْهِيَّةِ مَعَ الْأَمْثِلَةِ - وَكَيْفَ انْعَكَسَتْ هَذِهِ الْفُرُوقُ فِي الْقَانُونِ؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি শরিয়তে রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান দুটি হলো 'তালাক' এবং 'ফাসখ'। সাধারণ মানুষ অনেক সময় এই দুটির মধ্যে গুলিয়ে ফেলে। কিন্তু ফিকহী বিধান, ফলাফল এবং আইনি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

ফিকহী দৃষ্টিতে পার্থক্যসমূহ:

পার্থক্যের বিষয়	তালাক (الطلاق)	ফাসখ (الفسخ)
১. সংজ্ঞা	তালাক অর্থ নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করা।	ফাসখ অর্থ বিবাহের চুক্তিটি বাতিল বা অকার্যকর করে দেওয়া (Annulment)।
২. প্রয়োগকারী	এটি সাধারণত স্বামীর একচ্ছত্র অধিকার। (স্বামী প্রয়োগ করে)।	এটি আদালতের বা কাজীর রায়ের মাধ্যমে কার্যকর হয়।
৩. কারণ	কোনো কারণ ছাড়াই স্বামী তালাক দিতে পারে (যদিও মাকরুহ)।	সুনির্দিষ্ট শরয়ী কারণ (যেমন— স্বামীর অক্ষমতা, নিখোঁজ হওয়া) ছাড়া ফাসখ হয় না।

৪. তালাকের সংখ্যা	তালাক দিলে তালাকের সংখ্যা কমে যায় (৩টির মধ্যে ১টি কমে)।	ফাসখের দ্বারা তালাকের সংখ্যা কমে না। এটি তালাক হিসেবে গণ্যই হয় না।
৫. মহরানা	সহবাসের আগে তালাক হলে অর্ধেক মহর দিতে হয়।	স্ত্রীর দোষে সহবাসের আগে ফাসখ হলে কোনো মহর দিতে হয় না।

উদাহরণ (আল-আমসিলা):

- **তালাকের উদাহরণ:** স্বামী স্ত্রীকে বলল, "তোমাকে তালাক দিলাম"। এতে তালাক পতিত হলো এবং ৩টি তালাকের অধিকার থেকে ১টি কমে গেল।
- **ফাসখের উদাহরণ:**
    - **খিয়ারে বুলুগ:** নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে হয়েছিল, বালেগ হওয়ার পর মেয়েটি আদালতের মাধ্যমে বিয়ে ভেঙে দিল। এটি ফাসখ।
    - **পুরুষত্বহীনতা:** স্বামী নপুংসক প্রমাণিত হওয়ায় কাজী বিয়ে বিচ্ছেদ করলেন। এটি ফাসখ।

আইনে প্রতিফলন (Reflection in Law):

বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইনে তালাক ও ফাসখের পার্থক্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়:

১. তালাক সংক্রান্ত আইন:

'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১' মূলত তালাক নিয়ন্ত্রণ করে। এই আইনের ৭ নং ধারায় তালাক প্রদানের পদ্ধতি (নোটিশ, সালিশি পরিষদ, ৯০ দিন) বর্ণনা করা হয়েছে। এটি স্বামীর অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্র।

২. ফাসখ সংক্রান্ত আইন:

'মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯' (The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939) মূলত ফাসখের বিধানাবলি ধারণ করে।

- এই আইনের ২ নং ধারায় ৯টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন— স্বামী ৪ বছর নিখোঁজ, ২ বছর ভরণ-পোষণ না দেওয়া, ৭ বছর কারাদণ্ড, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি)।
- এই কারণগুলোর ভিত্তিতে স্ত্রী যখন আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করে এবং আদালত ডিক্রি জারি করে, তখন ফিকহী পরিভাষায় একে 'ফাসখ' বা 'তাফরিক' বলা হয়।
- যদিও ১৯৩৯ সালের আইনের ডিক্রিকে শাব্দিক অর্থে 'তালাক' বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে এটি বিচারিক বিচ্ছেদ বা ফাসখ।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

তালাক হলো স্বামীর ক্ষমতা, আর ফাসখ হলো আদালতের ক্ষমতা যা স্ত্রীর অধিকার রক্ষায় ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশী আইনে ১৯৩৯ সালের আইনটি ফাসখের বাস্তব রূপ, যা নারীদের জুলুম থেকে বাঁচার পথ করে দিয়েছে।

প্রশ্ন-১০: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। এটি মুসলিম পারিবারিক আইনে কী ধরনের সংস্কার এনেছে?

نَاقِشْ أَهْدَافَ الْمَرْسُومِ الْعَائِلِيِّ الْإِسْلَامِيِّ لِعَامِ 1961 وَمِيزَاتِهِ - وَمَا هِيَ أَنْوَاعُ الْإِصْلَاحَاتِ الَّتِي أَتَى بِهَا فِي قَانُونِ الْأُسْرَةِ الْمُسْلِمَةِ؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ (Muslim Family Laws Ordinance, 1961) বাংলাদেশের পারিবারিক আইন ব্যবস্থার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ও সংস্কারমূলক আইন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অধিকার বঞ্চনা, এতিমদের উত্তরাধিকার না পাওয়া এবং তালাক ও বহুবিবাহের অপব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এই অধ্যাদেশ জারি করে। এটি হানাফি ফিকহের কিছু বিধানকে রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার করেছে।

আইনের উদ্দেশ্যসমূহ (আহদাফুল কানুন):

এই অধ্যাদেশ প্রণয়নের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্যগুলো ছিল:

১. এতিমদের সুরক্ষা: মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার কোনো সন্তান মারা গেলে, সেই মৃত সন্তানের ছেলে-মেয়েরা (নাতি-নাতনি) যাতে দাদার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হয়।

২. বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ: পুরুষদের যত্রতত্র ও কারণ দর্শানো ছাড়া একাধিক বিবাহ করার প্রবণতা রোধ করা।

৩. তালাক প্রথা নিয়ন্ত্রণ: রাগের মাথায় তাৎক্ষণিক তালাক দিয়ে সংসার ভাঙার প্রবণতা কমানো এবং তালাক কার্যকর করার একটি আইনি কাঠামো তৈরি করা।

৪. বিবাহ নিবন্ধন: মৌখিক বিবাহের আইনি জটিলতা এড়াতে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা।

প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সংস্কারসমূহ (আল-ইসলাহাত):

এই অধ্যাদেশটি মুসলিম পারিবারিক আইনে ৫টি বড় ধরণের সংস্কার এনেছে:

১. উত্তরাধিকারে প্রতিনিধিত্বের নীতি (৪ নং ধারা):

চিরাচরিত হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, বাবার আগে সন্তান মারা গেলে নাতি-নাতনিরা দাদার সম্পত্তি পায় না। কিন্তু এই আইনের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার কোনো সন্তান মারা গেলে, ওই সন্তানের ছেলে-মেয়েরা (নাতি-নাতনিরা) ঠিক ততটুকু অংশ পাবে, যতটুকু তাদের বাবা বা মা বেঁচে থাকলে পেতেন। এটি এই আইনের সবচেয়ে বৈপ্লবিক সংস্কার।

২. বিবাহের রেজিস্ট্রেশন (৫ নং ধারা):

এই আইনে প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রি বা নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বিবাহ সম্পন্ন করলে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

৩. বহুবিবাহের ওপর বিধি-নিষেধ (৬ নং ধারা):

দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য 'সালিসি পরিষদ'-এর অনুমতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমান স্ত্রীর অনুমতি এবং যৌক্তিক কারণ (যেমন— বন্ধ্যাত্ব, অসুস্থতা) ছাড়া সালিসি পরিষদ অনুমতি দেবে না। অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে জেল-জরিমানা এবং তাৎক্ষণিক মোহরানা পরিশোধের বিধান রাখা হয়েছে।

৪. তালাক প্রদানের পদ্ধতি (৭ নং ধারা):

তালাক কার্যকরের জন্য চেয়ারম্যান ও স্ত্রীকে লিখিত নোটিশ দেওয়া এবং ৯০ দিন অপেক্ষা করার বিধান চালু করা হয়েছে। এই ৯০ দিনের মধ্যে সালিসি পরিষদ আপস-মীমাংসার চেষ্টা করবে। এই পদ্ধতির ফলে তাৎক্ষণিক তিন তালাকের প্রথা কার্যত অকার্যকর হয়ে গেছে এবং তালাক প্রত্যাহারযোগ্য (রাজয়ী) রূপ পেয়েছে।

৫. মোহরানা পরিশোধ (১০ নং ধারা):

কাবিননামায় মোহরানা পরিশোধের পদ্ধতি উল্লেখ না থাকলে সম্পূর্ণ মোহরানা 'মুয়াজ্জাল' বা 'চাহিবা মাত্র দেওয়যোগ্য' (নগদ) বলে গণ্য হবে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

১৯৬১ সালের অধ্যাদেশটি আলেম সমাজের একাংশের সমালোচনার সম্মুখীন হলেও, এটি নারীদের আইনি অধিকার রক্ষায় এবং পারিবারিক শৃঙ্খলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ পেয়েছে।

প্রশ্ন-১১: দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার (ইস্তিরদাদুল হুকুকিজ জাওজিয়্যাহ) বলতে কী বোঝায়? কোন পরিস্থিতিতে আদালত এ অধিকার পুনরুদ্ধারের আদেশ দেন— পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
(مَا الْمَقْصُودُ بِـ "اسْتِرْدَادِ الْحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ"؟ وَاشْرَحِ الظُّرُوفَ الَّتِي تَأْمُرُ فِيهَا الْمَحْكَمَةُ بِإِعَادَةِ هَذَا الْحَقِّ فِي ضَوْءِ مَرْسُومِ مَحْكَمَةِ الْأُسْرَةِ لِعَامِ 1985)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বসবাস করা এবং একে অপরের সাহচর্য লাভ করা। যদি কোনো এক পক্ষ (সাধারণত স্ত্রী) বিনা কারণে অন্য পক্ষকে (স্বামীকে) ছেড়ে আলাদা থাকে, তবে অপর পক্ষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। এই অধিকার আইনি প্রক্রিয়ায় ফিরে পাওয়াকে 'দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার' বলা হয়। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫-এর ৫ নং ধারা অনুযায়ী এটি একটি বিচার্য বিষয়।

দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের সংজ্ঞা:

যখন স্বামী বা স্ত্রী কোনো যৌক্তিক বা আইনগত কারণ ছাড়াই একে অপরের সাহচর্য ত্যাগ করে বা দাম্পত্য দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকে, তখন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আদালতের মাধ্যমে অপর পক্ষকে ফিরে আসার বা দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার যে ডিক্রি বা আদেশ লাভ করে, তাকে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার বলে।

আদালত কখন পুনরুদ্ধারের আদেশ দেয়? (শুরুতুল ইস্তিরদাদ):

আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে:

১. বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বৈধ বিবাহ বিদ্যমান।

২. বিবাদী (স্ত্রী/স্বামী) কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই ঘর ছেড়েছে।

৩. বাদীর (স্বামী/স্ত্রী) আচরণের কোনো ত্রুটি নেই যা অপর পক্ষকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছে।

এমতাবস্থায় আদালত স্ত্রীকে স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়ার বা স্বামীকে স্ত্রীর সাথে সংসার করার নির্দেশ দিতে পারে।

কখন আদালত প্রত্যাখ্যান করতে পারে? (প্রতিরোধের কারণসমূহ):

নিম্নোক্ত কারণগুলো প্রমাণিত হলে আদালত স্বামীর মামলা খারিজ করে দেবে এবং স্ত্রীকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে না:

১. মোহর না দেওয়া: স্বামী যদি আশু মোহরানা (Prompt Dower) পরিশোধ না করে।

২. নিষ্ঠুরতা (Cruelty): স্বামী যদি স্ত্রীকে শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতন করে, যা স্ত্রীর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

৩. মিথ্যা অপবাদ: স্বামী যদি স্ত্রীর চরিত্রের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়।

৪. কুস্থানে বসবাস: স্বামী যদি স্ত্রীকে এমন জায়গায় রাখতে চায় যা ভদ্রোচিত নয় বা যেখানে নিরাপত্তা নেই।

৫. দ্বিতীয় বিবাহ: স্বামী যদি ১৯৬১ সালের আইন লঙ্ঘন করে অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করে।

বর্তমান আইনি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট:

যদিও আইনে এই বিধান আছে, কিন্তু আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় আদালত জোর করে কোনো নারীকে অনিচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীর ঘরে পাঠায় না। কারণ এটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী হতে পারে। আদালত সাধারণত আপস-মীমাংসার চেষ্টা করে। যদি স্ত্রী মোটেও রাজি না হয়, তবে আদালত বিবাহ বিচ্ছেদের পরামর্শ দিতে পারে। এই মামলাটি বর্তমানে স্বামীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীর করা ভরণ-পোষণ বা তালাকের মামলার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার মামলাটি মূলত সংসার টিকিয়ে রাখার একটি আইনি প্রয়াস। তবে স্ত্রীর নিরাপত্তা এবং সম্মান নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আদালত এই আদেশ দেয় না। এটি একপাক্ষিক কোনো অধিকার নয়।

প্রশ্ন-১২: মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ ও ১৯৯৪ (সংশোধিত)-এর আওতায় বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। রেজিস্ট্রেশন না করার শাস্তি কী?

حَلِّلْ عَمَلِيَّةَ تَسْجِيلِ الزَّوَاجِ وَالطَّلَاقِ بِمُوجِبِ قَانُونِ تَسْجِيلِ الزَّوَاجِ وَالطَّلَاقِ الْإِسْلَامِيِّ لِعَامَيْ 1974 وَ 1994 (الْمُعَدَّل) وَأَهَمِّيَّتَهُ - وَمَا هِيَ عُقُوبَةُ عَدَمِ التَّسْجِيلِ؟

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

একটি বিবাহ বা তালাকের আইনি বৈধতা প্রমাণের মূল দলিল হলো রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন। ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশে রেজিস্ট্রেশনের কথা বলা হলেও, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকার 'মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন' পাস করে এর প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে (যেমন ১৯৯৪, ২০০৯ সালে) এই আইন ও বিধিমালার সংশোধন করে ফি এবং শাস্তির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া (ইজরাআতুত তাসজিল):

এই আইনের আওতায় সরকার প্রতিটি এলাকা বা ওয়ার্ডের জন্য একজন 'নিকাহ রেজিস্ট্রার' বা কাজী নিয়োগ দেয়।

১. বিবাহ রেজিস্ট্রেশন:

- বিবাহ অনুষ্ঠানে নিকাহ রেজিস্ট্রার উপস্থিত থাকলে তিনি সাথে সাথেই বিবাহ রেজিস্ট্রি করবেন এবং বর-কনের দস্তখত নেবেন।
- যদি অন্য কেউ (মৌলভী বা ইমাম) বিবাহ পড়ান, তবে বর বা বিবাহ সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে **৩০ দিনের মধ্যে** কাজীর অফিসে গিয়ে বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে হবে।
- কাজীর দায়িত্ব হলো বর ও কনের বয়স প্রমাণের দলিল (জন্ম সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্র) যাচাই করা।

২. তালাক রেজিস্ট্রেশন:

- তালাক কার্যকর হওয়ার পর (সাধারণত নোটিশ দেওয়ার ৯০ দিন পর) নিকাহ রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে তালাক রেজিস্ট্রি করতে হয়।

রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব (আল-আহম্মিয়াহ):

১. প্রমাণাদি সংরক্ষণ: আদালতে মোহরানা, ভরণ-পোষণ বা উত্তরাধিকার দাবির ক্ষেত্রে কাবিননামাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য দলিল। রেজিস্ট্রেশন না থাকলে বিবাহ প্রমাণ করা কঠিন।

২. বাল্যবিবাহ রোধ: বয়স প্রমাণের সনদ যাচাই করার ফলে ভুয়া বয়স দিয়ে বাল্যবিবাহ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৩. প্রতারণা রোধ: রেজিস্ট্রেশন থাকলে স্বামী বা স্ত্রী কেউ চাইলেই বিবাহ অস্বীকার করতে পারে না।

রেজিস্ট্রেশন না করার শাস্তি (আল-উকুবাহ):

১৯৭৪ সালের আইনের ৫(৪) ধারা অনুযায়ী (যা পরবর্তীতে সংশোধিত হয়েছে), বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

- **শাস্তি:** যে ব্যক্তি বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করবে না বা করার উদ্যোগ নেবে না, তার শাস্তি হলো— **২ বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড** অথবা **৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা** (সংশোধিত আইনে জরিমানার পরিমাণ বাড়ানো হতে পারে) বা উভয় দণ্ড।

- **বিচারের এখতিয়ার:** এই অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হয়ে থাকে।

বিবাহের বৈধতা:

রেজিস্ট্রেশন না করলেও ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী সাক্ষী ও ইজাব-কবুলের মাধ্যমে বিবাহ 'সহীহ' হয়ে যায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে এটি অপরাধ এবং রেজিস্ট্রেশনবিহীন বিবাহ আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন কেবল আইনের পালন নয়, এটি একটি সামাজিক নিরাপত্তা। বর্তমান যুগে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বিবাহ করা নিজের পায়ে কুড়াল মারার শামিল। পারিবারিক শান্তি ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রেজিস্ট্রেশনের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন-১৩: স্ত্রীর ভরণ-পোষণ (নাফাকাহ) সম্পর্কে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর বিধানগুলো কী কী? স্ত্রী কখন ভরণ-পোষণের অধিকার হারায়?

مَا هِيَ أَحْكَامُ مَرْسُومِ الْعَائِلَةِ الْمُسْلِمَةِ لِعَامِ 1961 بِخُصُوصِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ؟ وَمَتَى تَفْقِدُ الزَّوْجَةُ حَقَّهَا فِي النَّفَقَةِ؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ বা 'নাফাকাহ' স্বামীর ওপর ফরজ। কিন্তু অনেক স্বামী অবহেলাবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ দেয় না। আগে এর জন্য দীর্ঘ দেওয়ানি মামলার প্রয়োজন হতো। এই ভোগান্তি কমাতে **১৯৬১** সালের অধ্যাদেশের ৯ নং ধারায় ভরণ-পোষণ আদায়ের একটি দ্রুত ও সহজ প্রশাসনিক পদ্ধতি রাখা হয়েছে।

১৯৬১ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী ভরণ-পোষণের বিধান (৯ নং ধারা):

যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে পর্যাপ্ত ভরণ-পোষণ না দেয়, অথবা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমানভাবে ভরণ-পোষণ বন্টন না করে, তবে স্ত্রী নিম্নোক্ত আইনি প্রতিকার পেতে পারেন:

১. চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন:

স্ত্রী স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌর মেয়রের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ বা আবেদন করতে পারেন। এখানে আদালতের মতো জটিল প্রক্রিয়া নেই।

২. সালিসি পরিষদ গঠন:

আবেদন পাওয়ার পর চেয়ারম্যান একটি 'সালিসি পরিষদ' গঠন করবেন। এই পরিষদে চেয়ারম্যান ছাড়াও স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন।

৩. পরিমাণ নির্ধারণ ও রায়:

সালিসি পরিষদ স্বামীর আয় এবং স্ত্রীর প্রয়োজন বিবেচনা করে ভরণ-পোষণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (টাকা) নির্ধারণ করে দেবে। একই সাথে বকেয়া ভরণ-পোষণও নির্ধারণ করতে পারে। পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে, যদি তা সর্বসম্মত হয়।

৪. আদায়ের কঠোর পদ্ধতি:

স্বামী যদি সালিসি পরিষদের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ না করে, তবে ৯ নং ধারার ৩ উপ-ধারা অনুযায়ী, বকেয়া ভরণ-পোষণ 'বকেয়া ভূমি রাজস্ব' হিসেবে আদায় করা হবে। অর্থাৎ, সরকার যেভাবে জমির খাজনা অনাদায়ে কঠোর ব্যবস্থা নেয় (সম্পত্তি ক্রোক বা নিলাম), ঠিক সেভাবেই স্বামীর কাছ থেকে টাকা আদায় করে স্ত্রীকে দেওয়া হবে।

স্ত্রী কখন ভরণ-পোষণের অধিকার হারায়? (মুসকিাতুন নাফাকাহ):

আইন ও শরিয়তের দৃষ্টিতে কিছু বিশেষ কারণে স্ত্রী তার ভরণ-পোষণের অধিকার হারায়:

১. বিনা কারণে গৃহত্যাগ: স্ত্রী যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায় এবং স্বামীর ডাকে ফিরে না আসে।

২. নাশিজা বা অবাধ্য হওয়া: স্ত্রী যদি স্বামীর ন্যায়সঙ্গত আদেশ অমান্য করে বা স্বামীর অবাধ্য হয় (যেমন— স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে ঘোরাফেরা করা)।

৩. ধর্মত্যাগ (ইরতিদাদ): স্ত্রী যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে (নাউজুবিল্লাহ)।

৪. কারাদণ্ড: স্ত্রী যদি কোনো অপরাধে জেলে থাকে, তবে সেই সময়ের ভরণ-পোষণ স্বামী দিতে বাধ্য নয়।

৫. স্বামী মারা গেলে: স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী আর ভরণ-পোষণ পায় না, বরং সে উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পত্তি পায়। (তবে ইদ্দতকালীন সময়ে গর্ভবতী হলে পাবে)।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

৯ নং ধারাটি নারীদের অর্থনৈতিক সুরক্ষার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। স্বামী যাতে ভরণ-পোষণ দিতে গড়িমসি করতে না পারে, সে জন্য রাষ্ট্র এই ধারা অনুযায়ী সালিসি পরিষদকে বিচারিক ক্ষমতা দিয়েছে।

প্রশ্ন-১৪: পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ অনুযায়ী পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার ও কার্যপ্রণালী আলোচনা কর। এ আদালত কোন কোন বিষয়ে রায় দিতে পারে?

نَاقِشِ اخْتِصَاصَ مَحْكَمَةِ الْأُسْرَةِ بِمُوجِبِ مَرْسُومِ مَحْكَمَةِ الْأُسْرَةِ لِعَامِ 1985 وَإِجْرَاءَاتِهَا - وَمَا هِيَ الْقَضَايَا الَّتِي يُمْكِنُ لِهَذِهِ الْمَحْكَمَةِ أَنْ تَحْكُمَ فِيهَا؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

বাংলাদেশে পারিবারিক বিরোধগুলো দ্রুত, সহজ ও স্বল্প খরচে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ' জারি করা হয়। এর মাধ্যমে সাধারণ দেওয়ানি আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা থেকে পারিবারিক মামলাগুলোকে আলাদা করা হয়েছে। সহকারী জজ আদালতগুলোই 'পারিবারিক আদালত' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার (৫ নং ধারা):

১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশের ৫ নং ধারা অনুযায়ী, পারিবারিক আদালত কেবলমাত্র ৫টি বিষয়ে বিচার করার একচ্ছত্র ক্ষমতা রাখে। এগুলো হলো:

১. বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক): তালাক, খুলা, বা লিআনের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইলে বা তালাক কার্যকর হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে চাইলে।

২. দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার: স্ত্রী বিনা কারণে চলে গেলে স্বামীকে, অথবা স্বামী স্ত্রীকে ঘরে না তুললে স্ত্রীকে অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া।

৩. মোহরানা: বাকি বা নগদ— যেকোনো প্রকার মোহর আদায়ের দাবি।

৪. ভরণ-পোষণ: স্ত্রী, সন্তান বা বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আদায়ের মামলা।

৫. অভিভাবকত্ব ও সন্তানের জিম্মাদারি: সন্তান কার কাছে থাকবে (হিযানাত) এবং সন্তানের শরীরের বা সম্পত্তির অভিভাবক কে হবে— এ সংক্রান্ত বিরোধ।

কার্যপ্রণালী বা বিচার পদ্ধতি (ইজরাআতুল মুহাকামা):

পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের থেকে রায় পর্যন্ত পদ্ধতিটি অত্যন্ত আধুনিক ও সহজ:

১. আরজি দাখিল: মাত্র ৫০ টাকা কোর্ট ফি দিয়ে আরজি দাখিলের মাধ্যমে মামলা শুরু হয়।

২. সমন জারি ও জবাব: বিবাদীর প্রতি নোটিশ পাঠানো হয় এবং বিবাদী হাজির হয়ে লিখিত জবাব দেন।

৩. প্রাক-বিচার শুনানি (Pre-trial Hearing): এটি এই আদালতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বিচারক সাক্ষ্য গ্রহণের আগেই উভয় পক্ষকে নিয়ে একান্ত বৈঠকে বসেন এবং আপস-মীমাংসার চেষ্টা করেন। যদি আপস হয়ে যায়, তবে সেখানেই মামলার নিষ্পত্তি হয়।

৪. বিচার ও সাক্ষ্য গ্রহণ: আপস না হলে বিচারক ইস্যু গঠন করেন এবং সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরা গ্রহণ করেন।

৫. বিচার-উত্তর শুনানি (Post-trial Hearing): রায় দেওয়ার আগেও বিচারক শেষবারের মতো আপসের চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হলে রায় বা ডিক্রি ঘোষণা করেন।

আপিল:

পারিবারিক আদালতের রায়ে কোনো পক্ষ অসন্তুষ্ট হলে, রায় ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে 'জেলা জজ' আদালতে আপিল করতে পারেন। জেলা জজের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশের বিচার পদ্ধতিটি অত্যন্ত কল্যাণমুখী। এখানে 'বিচার'-এর চেয়ে 'মীমাংসা'-কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে পারিবারিক বন্ধন টিকে থাকে এবং বিচ্ছেদ এড়ানো যায়।

প্রশ্ন-১৫: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী তালাকের ক্ষেত্রে সালিসি পরিষদের (Arbitration Council) ভূমিকা কী? এটি কীভাবে বিচ্ছেদ কার্যকর করতে সাহায্য করে?
(مَا هُوَ دَوْرُ "مَجْلِسِ التَّحْكِيمِ" فِي قَضَايَا الطَّلَاقِ بِمُوجِبِ مَرْسُومِ الْعَائِلَةِ الْمُسْلِمَةِ؟ وَكَيْفَ يُسَاعِدُ فِي تَنْفِيذِ الْانْفِصَالِ؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'সালিসি পরিষদ'। কুরআনে বর্ণিত 'হাকাম' বা সালিসের ধারণার ওপর ভিত্তি করে এটি গঠিত। তালাক, বহুবিবাহ এবং ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে এই পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সালিসি পরিষদের গঠন:

এই পরিষদ তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়:

১. স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা পৌর মেয়র (যিনি সভাপতি হবেন)।

২. স্বামীর মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

৩. স্ত্রীর মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

তালাকের ক্ষেত্রে ভূমিকা (৭ নং ধারা অনুযায়ী):

তালাক প্রদান ও কার্যকরের ক্ষেত্রে সালিসি পরিষদের ভূমিকা নিম্নরূপ:

১. নোটিশ গ্রহণ: স্বামী তালাক দেওয়ার পর চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত নোটিশ পাঠাবেন। চেয়ারম্যান নোটিশ পাওয়ার পর সালিসি পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নেবেন।

২. প্রতিনিধি তলব: চেয়ারম্যান স্বামী ও স্ত্রীকে ৩০ দিনের মধ্যে তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য নোটিশ দেবেন।

৩. আপস-মীমাংসার প্রচেষ্টা: পরিষদের প্রধান কাজ হলো তালাক কার্যকর হতে না দেওয়া। তারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর করে সংসার জোড়া লাগানোর চেষ্টা করবেন।

৪. ৯০ দিন সময়কাল: নোটিশ পাওয়ার পর থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত পরিষদ কাজ করবে। এই সময়ের মধ্যে তারা একাধিক বৈঠক করতে পারে।

বিচ্ছেদ কার্যকরে ভূমিকা:

- **মীমাংসা হলে:** যদি পরিষদের প্রচেষ্টায় স্বামী তালাক প্রত্যাহার করে (রুজু করে) এবং স্বামী-স্ত্রীর মিল হয়ে যায়, তবে পরিষদ তালাকটি নথিভুক্ত করবে না এবং সংসার বহাল থাকবে।
- **মীমাংসা না হলে:** যদি ৯০ দিনের মধ্যে কোনো সমাধান না আসে, অথবা স্বামী তালাক প্রত্যাহারে রাজি না হয়, তবে ৯০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সালিসি পরিষদ তালাকটি কার্যকর বলে ঘোষণা করবে এবং স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছেদের সনদ (তালাকনামা) প্রদান বা রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করবে।

বিশ্লেষণ:

সালিসি পরিষদের কাজ তালাক দেওয়া নয়, বরং তালাক ঠেকানো। কিন্তু যদি আপস সম্ভব না হয়, তবে তারা একটি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচ্ছেদ সম্পন্ন করতে সাহায্য করে, যাতে ভবিষ্যতে কোনো আইনি জটিলতা না থাকে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

সালিসি পরিষদ হলো পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির একটি ঘরোয়া আদালত। এটি আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা ও খরচ থেকে মানুষকে বাঁচায় এবং সমাজের মুরুব্বিদের মাধ্যমে সংসার টিকিয়ে রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে।